উপসংহার

সমস্ত বিশ্লেষণের পর এ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, দুর্ভিক্ষের মূলে জোরালো কারণ, জনগণের প্রতি আন্তরিকতাহীন একটা শোষণ রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা। খাদ্যের উৎপাদন-সংকট স্থান বা দেশ বিশেষে যে কোন সময় ঘটতে পারে। সভ্য মানুষ অর্থশাস্ত্রের সৃষ্টি করেছে সীমাবদ্ধ সম্পদের সুষম বন্টণের রীতি নীতি নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণের জন্য। পৃথিবীতে খাদ্য কখনো আলো, বাতাস, পানির মতো সুলভ এবং পর্যাপ্ত ছিল না। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যখন মুষ্টিমেয় ছিল তখনো দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট ছিল। এখন পাঁচ ছয়শ কোটি লোক। এখনো খাদ্য আছে এবং কখনো দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। এ পর্যন্ত যতো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কখনো বিশ্ব-ব্যাপী খাদ্য সংকট বলে কোন শব্দকে নির্ধারণ করা হয়নি। তাহলে দুর্ভিক্ষের মূলে কি ? মূলে হচ্ছে অর্থ সংকট, এবং এ অর্থ সংকট এসেছে শোষণ, মজুতদারী, লোভী এবং মানবতাহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। ফলে পরাধীন এবং অর্থনৈতিক সুষম বন্টনহীন অবস্থাতেই প্রায় দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। এর সাথে আরেকটা বিষয় বলার প্রয়োজন, এসব মানুষের সৃষ্টি। প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর দুর্ভিক্ষের জন্য যে উপ-করণ তৈরী করে মানুষই সেখানে কারিগরের ভূমিকা নিয়ে দুর্ভিক্ষটার বাস্তবায়ন করে। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে-ঈশ্বর একটা নকশা তৈরী করল দুর্ভিক্ষের জন্য। সে নক্শাতে কিছু যায় আসে না, যদি না মানুষ নামক কিছু কারিগর দলবদ্ধ হয়ে (টিম ওয়ার্ক করে) এক একজন এক একটা দায়িত্ব নিয়ে কাজের ভূমিকাটা পালন না করে। জ্বালানী এবং লাইটার পাশাপাশি রাখলে আগুন জ্বলে না। এক্ষেত্রে একজন মানুষের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের মূলে প্রকৃতি যখন জ্বালানী এবং লাইটার তৈরী করে মানুষ তখন এগিয়ে এসে বাকি কাজটা শেষ করে বলেই দুর্ভিক্ষ হয়। মানুষের এই ভূমিকাকে দমানো গেলেই দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর অন্যথা হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে। পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ না খেয়ে মরে কিংবা অর্ধাহারে থাকে। তাদের পরিমাণ এবং নির্মমতা আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকলে আমরা তাকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ দুর্ভিক্ষ বলি, আর পরিমাণটা

গা সওয়া ধরণের হলে তাকে এড়িয়ে চলি। অনাহারে অর্ধাহারে যে মৃত্যু বাস্তবে উপস্থিত কিন্তু খাতাপত্রে নেই, তা হচ্ছে পরোক্ষ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ অনেক সময় দুর্ভিক্ষ বলে স্বীকৃতি পায় না। এছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় পরিবহন ব্যবস্থা খাদ্য সরবরাহে বড় ধরণের বাধার সৃষ্ট করেছে। এটাও এ 'মন্বন্তরের' একটা মুখ্য কারণ। কখনো কখনো দেখা যায়, যে সময় প্রত্যন্তকলে গ্রামের হাটে কৃষক ফসলের মূল্য না পেয়ে বাজারে ঢেলে দিচ্ছে, তখন সেই একই ফসল শহরে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে, এর মূলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা এবং পরিবহন সংকট দায়ী, এই ব্যবস্থা ভাঙার উদ্যোগ নিতে হবে রাষ্ট্রকেই। পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে রাষ্ট্রীয় শস্য ক্রয় কেন্দ্র থাকে, যেখানে একটা নির্ধারিত দরে কৃষকের উৎপাদিত শস্য কিনে নেয়া হয়। দরটা অবশ্যই উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশী থাকে। শুধু মাত্র দেশে উৎপাদন টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হয়। আর - ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব থেকে গম কিনে দুর্ভিক্ষ-গ্রস্থ বাঙলাকে সরবরাহ করেছিল এক কোটি টাকা লাভ রেখে। কি শাসক ! কি রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থা ! কিছু মানুষ এবং সংগঠন এদের বিরুদ্ধে ছিল বলেই বাকি মানুষগুলি বেঁচে ছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ -

> "এ মন্বন্তরে মানুষের ঘর-গৃহস্থালী ভাঙিয়াছে, জীবন ব্যবস্থা, অর্থনীতিক বুনিয়াদ উল্টাইয়া গিয়াছে। বাঙালী পরপ্রত্যাশী ভিখারির জাতি হইতে চলিয়াছে।"[১]

পরিশেষে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে একমত পোষণ করে আমাদেরও বলা দরকার -

> "মন্বন্তর সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে বহু রহস্য প্রকাশ হইবে, এইরূপ দুর্দৈব যাহাতে আর ঘটিতে না পারে, দেশবাসী সে বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক হইতে পারিবেন। যাহাদের শক্তি ও অবসর আছে, পঞ্চাশের মন্বন্তর তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।"[২]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাস আমাদের সচেতন করে, আমাদের সতর্ক হতে প্ররোচিত করে। এই দিক থেকে এইসব উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

আজকের যুগে বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে উপন্যাস শাখা। বাংলা গদ্যের প্রবর্তনের পর পৌনেদুশ বছরে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখা এতো প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে, যা বিশ্বের খুব কম ভাষাতেই পাওয়া যায়। ড· বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> "মন্বন্তর-আশ্রয়ী গল্প অসংখ্য রচিত হয়েছে, সেই তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা অল্প। কারণ ছোটগল্প রচনা অপেক্ষা উপন্যাস রচনা আয়াসসাধ্য।"৩

মন্বন্তর-আশ্রয়ী উপন্যাস খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া মন্বন্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি শুধু মাত্র সংখ্যা দিয়ে না করে করা উচিৎ সৃজন-বৈচিত্র্যতা দিয়ে। বিভিন্ন লেখকদের মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস দাবী করে, উপন্যাস আজ বিচিত্র রূপে প্রবাহিত। জীবনকে এবং সমাজকে সব চেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে এসব উপন্যাস। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আনন্দ উল্লাস, ব্যক্তি· যন্ত্রণা, ব্যক্তি· জীবনের খুঁটিনাটি থেকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং শোষণ জগতের বিস্তৃত বিষয় ঐতিহাসিক আত্মিকধর্মী বর্ণনার দায়িত্ব বহন করেছে এসব উপন্যাস। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঔপন্যাসিকরা শুধু স্রষ্টা নন, আর্থ-সামাজিক দার্শনিক, ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, জীবনের আর্থ সামাজিক সমস্যার মূল স্রোতের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। এসব উপন্যাসের শুধু নান্দনিক সার্থকতা বিচার করলে তার পরিপূর্ণ রূপ উদঘাটিত হয় না কারণ লক্ষ্য এবং দর্শনহীন উপন্যাস, উপন্যাস নয়। একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য এবং একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন বা সমাধান যদি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে না দেখান, তবে সে উপন্যাস হয়ত আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ। আজকে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সে যুগের বিচারে উপন্যাস হলেও, আজকের বিচারে আরব্য উপন্যাস বা নিছক প্রেমকাহিনী কোন সার্থক উপন্যাস নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস নিয়ে পাঠকের এবং সমালোচকের অভিযোগ কম নেই। বঙ্কিমের সময়ে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ছিলেন। অপ্রতুল উপন্যাসকে তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ তখনকার পাঠকের ছিল না। আধুনিক

কালে পাঠকরা সে সুযোগ পাচ্ছে। তাই প্রাচুর্য এবং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকরা এগিয়ে যাচ্ছেন নিজস্ব বাগরীতি এবং স্বতন্ত্র চিন্তায়। কোন ঔপন্যাসিকের জীবনেই বিখ্যাত উপন্যাস খুব বেশী থাকে না। নিজের অজান্তেই হয়তো কোন লেখা স্থান-কাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপন্যাসের গর্বনীয় একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বাস্তববাদ। কল্পনাশ্রয়ী, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে সৃষ্ট উপন্যাস যতই তার গল্প আকর্ষণীয় হোক তাকে শিল্প রসোত্তীর্ণ রচনা বলা যায় না। মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাসগুলি বাস্তবতাকে সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে। এখানে লেখকের দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়।

পূর্ব বাংলার সাহিত্যে কবিতার তুলনায়-উপন্যাসে শূণ্যতা বেশী। খ্যাতিমান যে ক'জন লেখক দেশবিভাগ উত্তরকালে সাহিত্য চর্চা করেছেন তাদের কারোরই সৃষ্টি খুব বেশী নয়। ওয়ালী উল্লাহ, আবু ইসহাক, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, কাজী ইমদাদুল হক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখদের সৃষ্ট উপন্যাস পরিমাণে খুবই কম। আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান এবং পরবর্তী সময়ের কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া।

মন্বন্তরের সমস্ত উপন্যাসের একটি নির্দিষ্ট দুর্বলতা চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ উপন্যাসই সত্যিকার পরিপূর্ণ রসোত্তীর্ণ উপন্যাস নয়। যে সমস্ত শক্তিমান লেখক, যাঁরা তাদের যুগের সাহিত্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলো, তারাও সার্থক শিল্পোত্তীর্ণ মন্বন্তর আশ্রয়ী উপন্যাস পাঠককে উপহার দিতে পারেননি। একে লেখকের দুর্বলতা জ্ঞান করলে ভুল হবে। এর মূল কারণ নিহিত অন্যখানে। বাস্তব আঘাত তাদেরকে এমন বিপুল বিভ্রান্ত করেছিল শিল্প রসের এবং পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রতি তাদের দৃষ্টিক্ষেপ ছিল কম। ফলে সুস্থ শৈল্পীক পরিকল্পনায় রসাশ্রয়ী উপন্যাস লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। সে স্থান দখল করেছে, মনুষ্যত্বের আকালের প্রতি ক্ষোভ, আর্থ-সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা, কটাক্ষ, স্পষ্ট বক্তব্য, সাংবাদিকীয় ধর্মী পরিস্থিতি বর্ণনা। তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক, গোপাল হালদার, আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রমুখ শক্তিমান লেখকরা মন্বন্তরকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনা করলেও মন্বন্তর আশ্রয়ী তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাটি সৃষ্টি করতে পারেননি। ফলে 'পথের পাঁচালি,' 'অপরাজিত,' 'আরণ্যকের' 'মর্যাদা পায়নি 'অশনি সংকেত'। কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতির মর্যাদা পায়নি 'মন্বন্তর'। 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', প্রভৃতির মর্যাদা পায়নি 'চিন্তামণি'। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'কর্ণফুলী', 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি 'ক্ষুধা ও আশা '। 'একদা', 'আরেকদিন', 'অন্যদিন'এর মর্যাদা পায়নি 'উনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ','তেরশ পঞ্চাশ"। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম 'তিলাঞ্জলি'। তিলাঞ্জলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এটি সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস। মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে নতুন একজন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব। বাঙলা সাহিত্যে আর একটি সমৃদ্ধতার দ্বার উদঘাটন। কিন্তু 'তিলাঞ্জলি'ও যতো প্রচারধর্মী, শিল্পকর্ম হিশেবে ততো সার্থক নয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রায় উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ রূপে মুখ এবং মজুতদারীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মন্বন্তরের ইতিহাসবিদ বা গবেষকরাও এ দুটি কারণকে স্বীকার করেছেন। মন্বন্তরের কারণের সপক্ষে বিপক্ষের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদেরও এ দুটি কারণকে প্রধান কারণ রূপে মনে হয়েছে। এর সপক্ষে নিচের বিবৃতিগুলি পড়া যেতে পারে -

> "১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীদের হাতে বর্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। মিত্রশক্তির বিরাট নৌবহর রয়েছে সিংহলে। এক সিংহলেই যে বাংলার কত চাল রপ্তানী হয়, সে হিসাব পাওয়া যাবে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে।" [৪]
>
> "রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালে ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। ঘাটতি আরও সে কারণেই। ... উনিশশ বিয়াল্লিশ সালে যা আমদানি করা হয়েছিল, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়

তার চেয়ে অনেক বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভান্ডার।"[৫]

"তাহা ছাড়াও চাষের উপযুক্ত বহু সহস্র বিঘা জমি বিমানপোত, অবতরন ক্ষেত্র, সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে দখল করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে ... ১৯৪২ অব্দের ফসলের পরিমান হ্রাস পায়।"[৬]

"মন্বন্তরের কারণ মূলত দুটি প্রকৃতিসৃষ্ট কারণ ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। ... মনুষ্যসৃষ্ট কারণ - প্রথমত, যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কায় শস্য বাজেয়াপ্তকরণ বা শস্য - উৎপাদন বন্ধ হেতু দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিস, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারশ, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নাইজেরিয়া এবং ১৯৭৫-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পুচিয়া যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষে যুদ্ধের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

দ্বিতীয়ত, মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের মজুত কৌশলেও অনেক সময় ব্যাপক অন্নাভাব ঘটে থাকে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের এও আর একটি কারণ।"[৭]

মন্বন্তরের উপন্যাস সমূহেও এ দুটি কারণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'মন্বন্তর', 'অশনি সংকেত', 'চিন্তামণি', 'ক্ষুধা ও আশা' উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথ, 'তেরশ পঞ্চাশ', কালো ঘোড়া' প্রভৃতি উপন্যাসে, মন্বন্তরের মূলে যুদ্ধ এবং মজুতদারীটা এসেছে। লক্ষণীয় মন্বন্তরের সব কটি উপন্যাসে যে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে তার মধ্যে যুদ্ধ এবং মজুতদারী কিংবা মজুতদারীর ইঙ্গিত প্রধান। এ ছাড়া এসেছে যুদ্ধ সম্পর্কে এদেশের মানুষের একটা অস্পষ্ট ধারণা, নারীকেন্দ্রিক যৌন ব্যবসা, নিজের প্রয়োজনে পোষ্য বা আপনজনদের সাথে স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিষয়। এখানে 'পল আর গ্রীনো'র দুর্ভিক্ষ তত্ত্বের 'পোষ্যদের ত্যাগ' প্রায় ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এছাড়া ফুটে উঠেছে সমাজব্যবস্থা ও প্রচলিত রীতিনীতির বড় ধরণের ভাঙ্গন বা পরিবর্তন। ঔপন্যাসিকদের রচনায় দেখি তাঁরা সবচেয়ে বেশী আলোকপাত করেছেন সামাজিক পরিবর্তনের উপর। মৃত্যুর চেয়েও

যে পরিবর্তন যন্ত্রণা দায়ক এবং চিন্তাদায়ক। 'অশনি সংকেত', 'মন্বন্তর', 'ক্ষুধা ও আশা', 'চিন্তামণি' প্রভৃতি উপন্যাসে দেখা যায়, বিরাট পরিবর্তন ঘটে সামাজিক মূল্যবোধের। উল্লেখ করা যেতে পারে এ সমস্ত উপন্যাসে মন্বন্তরের ফলে লক্ষ লক্ষ যে নরনারীর মৃত্যু ঘটে তার শুধু বর্ণনা বড় নয়। সূক্ষ্ম ভাবে চিত্রিত পোষ্য-দের ত্যাগ করে গৃহস্বামীর পলায়ন, বাবা-মা মেয়েকে তুলে দিচ্ছে নারী ব্যবসায়ীর হাতে, দীর্ঘ দিনের বন্ধু এবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। গৃহবধূ সামান্য কিছু চালের জন্য শরীর বিকিয়ে দিচ্ছে। মন্বন্তরের সাথে সাথে সবাই হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে স্বার্থপর। যে ধর্ম ছিল পশুর, - গুতোগুতি বা কামড়াকামড়ি করে নিজে খাওয়া, মানুষ সে ধর্মকে বাঁচার অবলম্বন মনে করেছে যদিও মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য, কিন্তু ঔপন্যাসিকদের এ উপলব্ধি এতো বেশী বাস্তব যা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উপন্যাসে দেখা যায়, সামাজিক এ পরিবর্তন এতো দিনের ঐতিহ্যময় বাংলার সমাজ এবং গৃহ ব্যবস্থাকে সে যে ভেঙে দেয়, পরবর্তী সময়ে মানুষ সচ্ছল হলেও সমাজ ব্যবস্থা আগের স্থানে আর ফিরে আসে না। লক্ষ লক্ষ মেয়ে সে যে দেহ ব্যবসায় নামে তাদের আর ফিরে আসা হয় না সমাজে, হয়তো সমাজ ও আর তাদেরকে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেখা যায় সম্ভ্রম হারানো গীতাকে কানাই গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেও কানাইকে নিয়ে গীতা ঘর বাধার স্বপ্ন দেখতে সাহস পায় না। বিভিন্ন উপন্যাসে দেখা যায়, মন্বন্তর ছোট পরিবার থেকে একান্নবর্তী পরিবার পর্যন্ত ভেঙে লন্ডভন্ড করে ফেলেছে। পরিবারের সদস্য অনেক কমে যায়। কেউ মারা যায়, কেউ হারিয়ে যায়। 'ক্ষুধা ও আশা', 'মন্বন্তর', 'চিন্তামণি', 'কালো ঘোড়া', 'সংশপ্তক', 'তিলাঞ্জলি' প্রভৃতি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে মন্বন্তরের কারণে পরিবার ভাঙার কাহিনী। বাস্তবে মন্বন্তরের পরে বেড়ে উঠে ছোট পরিবার ব্যবস্থা। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে হয়তো দেরীতে হলেও কেউ কেউ চাকরি বা ছোট ছোট ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে উন্নতি করে সচ্ছল হয়, কিন্তু ভেঙে যাওয়া সমাজ, যে সমাজে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ছিল তা আর

গঠন হয় না। সৃষ্টি হয় ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা। মন্বন্তরের কয়েকটি উপন্যাসে কিছু কিছু চরিত্রের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তৎপরতার জোরালো উপস্থিতি দেখা যায়, যথা - 'ক্ষুধা ও আশা', 'উনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরশ পঞ্চাশ, 'তিলাঞ্জলি' প্রভৃতি উপন্যাস। তবে পরবর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস বিন্দু মানুষ হওয়াতে স্বাধীন পরবর্তী সমাজে মানুষকে নিয়ে রাজনীতি চর্চা এবং এর ফলে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। পলাশীর ঘটনায় জনগণ তখন যে অচেতন ছিল, ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে এবং স্বাধীনতার পরে তারা আর সে অসচেতন থাকে না। রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দিক।

মৃত্যুর চেয়েও যে বড় ট্রাজেডী থাকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় দেখা গেছে সে সবের ভূরি ভূরি দৃশ্য। যেমন - 'ক্ষুধার্ত ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা ছেলেকে জীবন্ত কবর দিচ্ছে। কিংবা 'নিজের বাচ্চাকে না দিয়ে মা নিজে খাচ্ছে।' এর চেয়েও ক্ষতিকর দিকে মৃত্যু ঘটেছে ভালোবাসার। 'মন্বন্তর', 'সূর্য দীঘল বাড়ী', গোপাল হালদারের মন্বন্তর ত্রয়ীতে দেখা যায় ভালোবাসার মানুষকে মানুষ ত্যাগ করে যাচ্ছে।

'In one centre regarding 1,000 out of 1,400 women, the husbands had left them behind in search of food and had not returned' [৮]

এর পাশাপাশি দেখা যায় আপন মেয়ের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে দেখা যায় গীতার বাবা-মা গীতাকে পণ্য করে তুলে, 'ক্ষুধা ও আশা'য় জোহাকে বাবা হয়ে নারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার কথা বলে হানিফ। মন্বন্তরের ফলে মানুষ যে নীতিবোধ হারিয়ে বসে তার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। লক্ষণীয় আর একটি বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে অসহায় মানুষের শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহরে ছুটাছুটি।

----- ০ -----

উল্লেখপঞ্জী :-

১। ড· বিনতা রায়চৌধুরী, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, পৃ·২
২। অনুরাধা রায়, অনুষ্টুপ : পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্পসাহিত্য, পৃ·১
৩। তসলিমা নাসরিন, ভূমিকা, ফ্যান দাও (সম্পাদিত - কবিতা সংকলন)
৪। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, পৃ·১০২
৫। ড· বিনতা রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·৩
৬। Hindustan Standard, 12 Dec. 1943 INDIA.
৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'
৮। তদেব